পূর্ব থেকে পশ্চিম
পর্বঃ ৮

বর্ষার প্রথম জল, যে-দিন এসে আমাদের বাড়ীর চারপাশটাতে জ'মে উঠত, কোথা থেকে যে সে-দিন শত-শত উভচর একসাথে ডাকতে শুরু ক'রতো, ছোটবেলায় সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বারবার অবাক হ'য়ে যেতাম। আজ বড়বেলায়ও সেই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তবে, এখন আর ছোটবেলার মত অবাক হ'তে পারিনা, অবাক হবার ক্ষমতাটুকু হারিয়ে ফেলেছি। এই দুষ্টু উভচর ব্যাঙগুলোর ডাকাডাকিতে চারপাশটা সরগরম হ'য়ে উঠলে, আমরাও খানিকটা দুষ্টু হ'য়ে এদের পিছনে পিছনে ছুটতে থাকতাম। বিশাল বিশাল লাফে ব্যাঙগুলো ছুটতে থাকতো দিগ্বিদিক। তার মাঝেই কেমন ক'রে জানি মোটামুটি অবধারিতভাবে প্রতিদিনই চীন দেশের কথা চ'লে আসত। কেউ না কেউ একবার ক'রে হ'লেও ব'লে উঠত, 'চীনারা না-কি ব্যাঙ খায়।' তারপর আরেকজন নাক-চোখ কুঁচকে তাকে সমর্থন দিয়ে বলতো, 'হুঁ! কি করে যে খায়?'

চীনার বা চাইনিজরা নিজ ইচ্ছায় যা খুশী খাবে, যত খুশি খাবে, তাতে আমার কিছু যেত আসতো না; কিন্তু যখন তারা বলত 'চীনারা', আমি তন্ময় হ'য়ে ভাবতাম তাহলে 'চীন' দেশ ব'লে কি জানি এক দেশ আছে। চুপি চুপি ভাবতাম কতদূরে সেটা? আমার নিজের পৃথিবী তখন খুব ছোট। বাড়ীর চারপাশ আর এদিক-সেদিক খানিক দূর পর্যন্ত আমার দৌড়। আমার মনে হ'তো, কি আছে সেই চীন দেশে? তারা কেমন করে কথা বলে? সেখানে কি বর্ষা আছে? বর্ষায় কি করে সেখানকার ছেলেমেয়েরা? কি করে শীত-বসন্ত-হেমন্তে? সেখানে কি শাপলা আছে? শিমুল তুলো আছে? এ-রকম হাজারো প্রশ্ন উঁকি দিত মনের কোণে। ঠিক সে সময় পাশের বাড়ির লজিং মাস্টার- অন্য আর সব লজিং মাস্টারের মত যিনিও প্রায় আইনস্টাইনের সমান জ্ঞান রাখতেন, এসে জিজ্ঞেস করতেন, 'এই বলতো দেখি, 'যে ব্যাঙটা ডাকে, সেটা পুরুষ না কি মহিলা।' আমি ভাবতাম, এটা আবার কি প্রশ্ন, ডাক দেখে কি আর বুঝা যায়, কোন ব্যাঙ পুরুষ আর কোন ব্যাঙ মহিলা? কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ব'লে দিতেন, 'মনে রাখবি, পুরুষ ব্যাঙ ডাকে, পুরুষ ময়ূর পেখম মেলে আর পুরুষ সিংহের কেশর থাকে।' আমি সাথে সাথে নিশ্চিত হ'য়ে যেতাম, নিঃসন্দেহে এই লোক পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। আইনস্টাইনকে তখন চিনতাম না ব'লে তাকে এক নাম্বার জায়গাটা দেয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলো না।

ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়, শিকাগো ক্যাম্পাসের স্টুডেন্ট সেন্টারে, আমার ছোটবেলার সেই ব্যাঙদের মত নিপুণ দক্ষতায়, এক সোফা থেকে অন্য সোফায় লাফ দিয়ে, ছেলেটি গিয়ে সেঁটে বসল তার বান্ধবী মেয়েটির কোলে। চারপাশে ব'সে থাকা অন্য সব বন্ধু-বান্ধবীদের খিলখিল হাসিতে যখন দশদিক মুখরিত, অথবা বান্ধবীর দেয়া অবিরাম চুমুর শব্দে যখন চাপা পড়ছিলো সেই-সমস্ত খিলখিল হাসির শব্দও, ঠিক তখনি 'আল্লাহু-আকবার' বলে রুকুতে চ'লে গেল লাইন করে সামনে পিছনে

দাঁড়ানো তেত্রিশ জন মুসলিম স্টুডেন্ট।

রমযান মাস। মুসলিম ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী শুদ্ধ ক'রে বলতে গেলে 'পবিত্র রমযান মাস।' মুসলিম স্টুডেন্টরা মাগরিবের নামাজ প'ড়ছে। খুব কষ্ট হল দৃশ্যটা দেখে। মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের এই রমযান মাস। যতদূর সম্ভব ভাব-গাম্ভীর্য আর শালীনতার মধ্য দিয়ে তারা রমযান মাসের করণীয়সমূহ পালন করে থাকে। নামাযের মাঝখানে এ-ধরণের ব্যাপার একদমই প্রত্যাশিত নয়। এমন নয় যে, যারা হাসাহাসি কিংবা ভালোবাসাবাসি ক'রছে, তারা জেনেশুনে ইচ্ছে ক'রে এমন করছে। তারা আসলে খেয়ালই করছে না; তাদেরকে বলে দেয়া হ'লে নিশ্চয় তারা নীরবতা বজায় রাখতো। অন্যদিকে, নামাজ পড়বার জন্য কিংবা তারপর ইফতার করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই জায়গাটা ছাড়া অন্য কোথাও জায়গাও দিতে পারে নি।

ধর্মকর্মের মাঝে একটা ব্যাপার আমাকে সবসময় উসাহিত করে। আমি মানুষের এক হ'য়ে কাজ করাতে উসাহবোধ করি। মনে হয় , যে কারণেই হোক না কেন, অন্তত কিছু মানুষতো এক হ'তে পেরেছে, একই উদ্দেশ্যে নিয়ে। যদিও একত্রিত হ'য়ে কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ মাঝে-মাঝে বিরক্তির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। মুসলিম ধর্মের একটা বিশেষ নির্দেশনা হলো, নিজে ধর্মকর্ম পালন করতে হবে, আবার অন্যকেও পালন করার জন্য উসাহিত করতে হবে। তাতে বোধহয় মুসলমানদের তথাকথিক বেহেস্ত লাভ করাটা সহজতর হয়। কর্মজীবনে দেখেছি, ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা সবসময় আমাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করত উপাসনালয়ে। মুসলিমদের পয়েন্ট সিস্টেমও চমকার।আমি যাই না যাই , তারা যে আমাকে যেতে বললো, তাতেই তাদের পয়েন্ট (সওয়াব) পাওয়া হ'য়ে যেত। আমি যাবোনা জেনেও ব্যাক্তিত্বহীনের মত তারা প্রতিদিন বারবার ব'লে যেত। আমি বিরক্ত হতাম না। হয়তো এর বদৌলতে তাদের বেহেস্ত লাভ সহজতরও হবে। আমাকে বিরক্ত ক'রে কিছু পায়, তো পাক না। অদল-বদলের ধর্ম এই ইসলাম। আপনি ইবাদত উপহার দিলে আপনাকে বেহেস্ত উপহার দেয়া হবে।

কিন্তু উপাসনালয় তথা মসজিদে না গেলেও, আমি যখন তাদের বলতাম, 'এত মানুষের একসাথে একই উদ্দেশ্যে যাওয়া, এই ব্যাপারটা আমার খুবই ভালো লাগে।' তারা আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বলত, 'হা হা হা! বুঝছেন তাহলে এতদিনে। এখানেই ইসলামের শক্তি।' তাদের সে হাসি দীর্ঘায়িত করতে দেবার মত ভদ্রলোক আমি নয়। পরক্ষণেই বলতাম, 'একই ভাবে আমার ভালো লাগে যখন দেখি এতগুলো মানুষ একসাথে পূজায় যাচ্ছে কিংবা গীর্জায় যাচ্ছে; কিংবা দেখি একদল পতিতা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য এক হয়ে প্রেস ক্লাবে যাচ্ছে। এখানে শক্তি কোনো ধর্মের নয়, শক্তি একত্বের, শক্তি বন্ধনের।' তবে সাথে সাথে আমি এটাও সবসময় চাইতাম, যে-যা করতে চায় বা যে-যা বিশ্বাস করতে চায়, তা যেন নিঃসঙ্কোচে ক'রে যেতে পারে। কিছু অবিশ্বাস কিংবা কিছু বিশ্বাসে আমার হয়তো কিছু বলবার আছে, কিন্তু ক্ষোভ নেই। বামহাতে মদের বোতল নিয়ে ডান হাতে কাউকে অযুর পানি তুলে দিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তিও নেই। আমার খুব ভালো লাগলো এত দূর

দেশে এসেও ধর্মকে উপলক্ষ্য ক'রে মানুষ এক কাতারে শামিল হতে পেরেছে।

এখানকার মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশানের প্রেসিডেন্ট এর ইফতারে আসবার ঘোষণায় আমি যোগদান করি। ইফতারের আয়োজন ভালোই। বুঝতে চেষ্টা করি ফান্ড আসে কোথা থেকে? এক পর্যায়ে জিজ্ঞেসও করি। তর্জনী দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দেয়া হয় একটা বাক্স, যার উপরে ছোট্ট করে লেখা 'ডোনেশান বাক্স'। 'ভিক্ষাবৃত্তি' ইসলামে নিষিদ্ধ হলেও, সবচেয়ে বড় ভিক্ষুক এই ধর্মের উপাসনালয়গুলো, মসজিদগুলো। কি বাংলাদেশের সেই পাড়া গাঁ, কি ইউএসএর বড় শহর, মুসিলিমরা বের হতে পারে নি 'ভিক্ষাবৃত্তি' থেকে। প্রতিটা মসজিদে 'দানবাক্স' থাকবেই। প্রথমে টিন কেনবার জন্য, তারপর ইট কেনবার জন্য, তারপর রড-সিমেন্ট, তারপর পাথর, তারপর মার্বেল পাথর। ভিক্ষাবৃত্তির এই দুষ্টু চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেনা তারা কখনো। সাগরের মাঝখানে মসজিদ হয়েছে, সাত আসমান না সতেরো আসমানের কাছে কোন জায়গায়তো আগে থেকেই ছিলো, এরপর টাকা চাইবে হিমালয়ের চূড়ায় কিংবা চাঁদের বুকে মসজিদ ক'রবার জন্য। ভিক্ষাই যদি ক'রতে হবে, তাহলে কেন আর সেই মসজিদ। মাটিতে বসে নামায পড়লেইতো কবুল হবার কথা।

মুসলিমরা দান বাক্সে দান করে অন্যজনের সাহায্যের জন্য নয়, বরং বেহেস্তে যাবার নোংরা লোভের বশবর্তী হ'য়ে। অবশ্য, সবাইকে সমানভাবে এক কাতারে ফেলে দেয়া যায়না। অনেক বড় মনের অধিকারী মুসলিমও আছেন, যারা প্রকৃত অর্থেই অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু তাদের পরিচয় আসলে মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান নয়, তারা বড় মনের মুসলিম নয়, তারা বড় মনের হিন্দু নয়, তার বড় মনের বৌদ্ধ নয়, তার বড় মনের খ্রিস্টান নয়, তার আসলে বড় মনের মানুষ।

রমযান শেষে যথারীতি 'ঈদ'। এখানে চাঁদ দেখে ঈদ হয় না। ঈদ হয় উইকেন্ড দেখে। ঊনত্রিশ কিংবা ত্রিশ যত রমযানই হোক না কেন, সুবিধামত ব'লে দেয়া হয়, 'আগামী কাল ঈদ।' ভাবখানা এমন যে, 'ঈদ বলেছি তো ঈদ। চাঁদ উঠানোতো আর আমাদের দায়িত্ব না। সেটা যার কাজ, সে দায়িত্বে অবহেলা ক'রলে আমাদেরতো আর কিছু করবার থাকে না। আমাদের কাজ ঈদ করা, আমরা তা করে ফেলবো। কিছুটা সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর কবিতার মত, "ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।" কিন্তু ওই বলা পর্যন্তই। ঈদ উদ্যাপন করা ব'লে খুব আহামরি কিছু নেই। সেটা এখানে এতই সাধারণ যে তার বর্ণনা দিয়ে শব্দ বাড়ানো প্রায় অপরাধের পর্যায়ে প'ড়ে যাবে।

ওদিকে বাঙ্গালি স্টুডেন্টদের একটা সংগঠন আছে শিকাগো শহরে।'বিআইসি' বা 'বেঙ্গলি ইন শিকাগো'। বেশিরভাগই কলকাতার বা ইন্ডিয়ার বাঙ্গালি। তারা পূজো উদ্যাপন করে মহাসমারোহে। পূজোর সময় তাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। মাসব্যাপী চলে প্রস্তুতি। পূজা উদযাপনের অংশ হিসেবে থাকে গান, নাচ, কবিতা ইত্যাদি। অন্যদিকে, পূজোয় নাটক থাকবে না, তাতো হ'তেই পারে

না। কলকাতার বিখ্যাত কোন এক নাট্যকার নাটক লিখে পাঠিয়ে দিলো। নাটকে নতুনদের সুযোগ দেয়া হয় বেশি। কিন্তু কলকাতার একটা নাটক হবে আর সেই নাটকে একটা চরিত্রের নাম 'হেবো' আর একটা চরিত্রের নাম 'পঁচা' হবে না, সেটা কি করে হয়। আর একটু আধটু ভূতের ব্যাপার-স্যাপার না থাকলে দর্শক সেই নাটক দেখবেইবা কেন। কিন্তু হেবো-পঁচা টাইপ নাটকে অভিনয়ের চেষ্টা করবার কোন ইচ্ছাই আমার নেই।

ওদিকে, এখানে নতুন এসেছি হিসেবে আমার উচিঅন্তত কিছু মানুষজনের সাথে পরিচিত হওয়া ; তাই ভাবলাম পূজোর সুযোগটা কাজে না লাগানো কোনভাবেই ঠিক হবেচনা। অবশেষে, আমি নাটকের তথা কালচারাল প্রোগ্রামের লাইটম্যান এর কাজ করবো ব'লে ঠিক করলাম। প্রথমে না বুঝে নিলেও পরে বুঝলাম, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছি। পূজোর তিনদিন আগ থেকেই সমস্ত পারফর্মাররাই অনুরোধ করতে লাগলো, তাদের নাচটা বা অভিনয়ের অংশটুকু আগেভাগে একটু দেখে যেতে; যেন তারা লাইটিং কি রকম হবে সেটা আগে থেকে ব'লে দিতে পারে। হঠাকরে নিজের এত চাহিদা দেখে ভাব বেড়ে গেলো। এবার সবাইকে অযথাই নির্দেশনা দিতে শুরু করলাম; এখানে এই হ'লে এই হ'তো, সেখানে এটা না ক'রে ওটা করলে ভালো হ'তো। মোটামুটি তারা এটা বুঝতে সমর্থ হল যে, আমার অবর্তমানে বাংলাদেশের নাট্যজগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হ'য়ে গেলো, তা পূরণ হওয়া এককথায় অসম্ভব ।

পূজোর দিন গিয়ে দেখলাম, বিশাল বিশাল লাইট এনে রাখা হয়েছে স্টেজের পাশে, যার কিছুই আমি চালাতে জানি না। কোনটা দিয়ে যে অন/অফ করতে হয় সেটা পর্জন্ত খুঁজে হয়রান। আমাকে দু'জন সহকারী দেয়া হলো। কিন্তু একটা লাইটিং সোর্স থেকে এত কিছু করা যায় দেখে আমি নিজেই অবাক হ'য়ে গেলাম। সবকিছু দেখে দেখে একবার চালিয়ে নিলাম। অন্যদেরকেও বুঝিয়ে দিলাম। সকালে দূর্গার পূজো করলাম, মন্ত্র পড়লাম, অঞ্জলি দিলাম। তারপর প্রোগ্রামের সময় ভয়ে ভয়ে তৈরী হলাম নিজের কাজ করবার জন্য। সবকিছুই ঠিকমতোই শুরু করলাম, শুধু চোখে উকট আলো পড়বার কারণে উপস্থাপিকার বিকট চিকারক 'রে উঠা ছাড়া। সে যাই হোক , কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে ট্রাফিক পুলিশের সমান ক্ষমতাবান মনে হ'তে লাগল। আমার আঙ্গুলের ঈশারায় সব লাইট নিভে যাচ্ছে, জ্বলে উঠছে। মনে হলো, আরে, ক্ষমতা জিনিসটাতো যতটা খারাপ ভেবেছি ততটা খারাপ না। সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিলো, ভূতের নাচের লাইটিং। ভূতের নাচানাচির সাথে এত দ্রুত আমাকে লাইট মোভ করাতে হচ্ছিলো যে, ভূত স্টেইজে নাচছে আর আমি যেন নীচে নাচছি।ভূত এবং আমি দু'জনেই হয়রান হ'য়ে গেলাম।

প্রোগ্রামের পর আমার মনে হলো, এতদিন আযথাই আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেইনি। সিনেমা-নাটকেতো এটাই আসল কাজ হওয়া উচি।সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মত যখন সন্ধ্যা নামলো, সেখানেই শেষ করলাম। কিন্তু টায়ার্ড হতে পারিনি। টায়ার্ড হবার জন্যতো সময়

লাগবে। টায়ার্ড হবার সেই সময়টা কোথায়? পরের দিনইতো পরীক্ষা। তাই বাসায় ফিরে সাথে সাথেই চোখ রাখতে হয়েছে বইয়ের বিশ্রী,জঘন্য আর কুসিতপাতায় পাতায়। (চলবে...)

পরশপাথর
ডিসেম্বার ১৫, ২০০৯
Poroshpathor81@yahoo.com